তৃতীয় অধ্যায়

পল্লীচিত্র ও পল্লী প্রকৃতি

১.

বাংলা সাহিত্যে পল্লী পরিচয় আদি কবিতা চর্যাগীতি থেকেই পাওয়া যায়। চর্যাগীতির অনেক পদে পল্লী মানুষের কথা, প্রাকৃতিক চিত্র এবং জীবনাচারের পরিচয় আছে। মধ্য-যুগের মঙ্গল কাব্যগুলিতেও অনেক জায়গায় এই পল্লীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'ময়মনসিংহ-গীতিকার মধ্যে বাংলার পল্লীজীবনের সুন্দর চিত্র আছে। কবিরা যে গ্রামীন পরিবেশে কবিতা লিখতেন সেই পরিবেশ তাঁদের কবিতায় ফুটে উঠেছিল। বাংলা কবিতায় পল্লীকে নিয়ে লেখা অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় পাওয়া গেল আধুনিক কালে। একালে রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের কবিরা অনেকেই পল্লী জীবন এবং পল্লী পরিবেশকে নিয়ে কবিতা লিখলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেও পল্লী জীবনের কিছু কিছু ছবি পাওয়া যায়। তবে রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের মধ্যে করুনানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়ের কবিতায় এই পল্লী জীবন্ত হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পল্লীগ্রাম একটি অক্ষয়, শান্তি ও সৌন্দর্যের আধার বলে চিত্রিত হয়েছিল। তিনি ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় হিসেবে গ্রামকে দেখিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিতায় পল্লীর চিত্র কিছু কিছু থাকলেও রবীন্দ্রানুসারী কবিদের হাতেই এই পল্লীর রূপ বিকশিত হল। এঁরা রবীন্দ্রনাথের মত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের সন্ধান করেননি। কোনো অধরা সৌন্দর্যলোকের ও মাধুরী আস্বাদন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের মত গভীর সৌন্দর্যানুভূতিও এঁদের সকলের ছিল না। অথচ এঁদের সকলের কাব্য সংস্কারের মূলে ছিল রোমান্টিক অনুপ্রেরণা। এর ফলে বাস্তবের রূঢ় পরিবেশ থেকে সরে গিয়ে এঁরা পল্লী গ্রামকেই শান্তি ও সৌন্দর্যের আশ্রয় বলে ভেবেছিলেন। এঁদের অনেকেই ছিলেন জন্মসূত্রে গ্রামের মানুষ। কুমুদরঞ্জন আজীবন গ্রামেই কাটিয়েছেন। জসীমউদ্দিনও ছিলেন গ্রামজীবনের সার্থক রূপকার। তার ফলে এঁদের 'গ্রামপ্রীতি যেমন অস্থি মজ্জায় মিশ্রিত'[১] তেমনি আবার নানা সহজ সৌন্দর্যের দ্বারাই চিত্রিত। বাংলা সাহিত্যে পল্লী জীবন রবীন্দ্রনাথের লেখায় যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল।

তাঁর বহু কবিতায়, গল্পগুচ্ছের বহু গল্পে এবং ছিন্নপত্রাবলীতে বাংলার পল্লী প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রীতি একটা রোমান্টিক বাতাবরণের দ্বারা মোহময় হয়ে উঠেছে। অন্য দিকে কুমুদরঞ্জনের লেখায় পল্লীর সহজ সরল রূপের পরিচয় এবং কবির গভীর পল্লীপ্রাণতা ফুটে উঠেছে। কবি জসীমউদ্দিনেরও কাব্যে এই সহজ সরল এবং গ্রামীন জীবন চিত্রের সহজ সরল রূপায়ন লক্ষ করা যায়। কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পল্লীপ্রীতি সুগভীর বিশ্বাসের দ্বারাই অনুরঞ্জিত। কুমুদরঞ্জন লিখেছেন :

তোমারে যে আমি ভালবাসিয়াছি কাব্য পড়িয়া নহে।
নহেক শ্যামল স্নেহের লাগিয়া অন্যে সে কথা কহে।
হয়েছি তোমার সুখ-দুঃখ-ভাগী
নয় তা নেহাত অভাবের লাগি
আমার ভক্তি এ অনুরক্তি বুকের রক্তে বহে।[২]

কবির এই উক্তির মধ্যে তাঁর গভীর পল্লীচেতনা খুঁজে পাওয়া যায়। কবি করুনানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায়ও গ্রামের অপূর্ব রূপচিত্র এবং তার মধ্যে কবির জীবন যাপনের বাসনা ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন :

ছুটব আমি সরল প্রাণে
পর্ণ কুটীর হতে
ধান নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুটব আলি পথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে
শুকতারাটি জাগবে দূরে
কান জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে স্রোতে।[৩]

এই উক্তি অনেকটা রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা মন্ডিত। এরই সঙ্গে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কথা মনে করা যায়। যতীন্দ্রমোহনও পল্লীর প্রতি প্রবল অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'জন্মভূমি' কবিতায়। কবি লিখেছেন :

ঐ যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা 'আইরি' ক্ষেতের আড়ে -
প্রান্তটি যার আঁধার করা সবুজ কেয়া ঝাড়ে।
পূবের দিকে আম কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা
জটলা করে যাহার তলে রাখাল বালকেরা - [৪]

এই পল্লীপ্রীতি, যা রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজে একটি সাধারণ ধর্ম হিসেবে দেখা দিয়েছিল. তা কবিশেখরের হাতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। সহজ সরল জীবনের প্রতি আগ্রহ, নগর জীবনের তুলনায় পল্লী জীবনের শান্ত স্নিগ্ধতা পল্লীর মানুষের সুখ দুঃখের নিবিড় আলিঙ্গন সবই তাঁর পল্লী কবিতাগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এক দিকে যেমন কুমুদরঞ্জন বা করুনানিধানের মত তিনিও পল্লীজীবনের সুনিপুন চিত্রকর, অন্যদিকে আবার তাঁর পল্লী কবিতাগুলি স্বাতন্ত্র্যে একান্তই তাঁর সৃকীয় সৃষ্টি।

২.

জন্মসূত্রে কবিশেখর ছিলেন গ্রামের মানুষ। তাঁর বাল্য এবং কৈশোরের অনেকগুলি দিন গ্রামেই কেটেছিল। বড় বয়সেও সে কথা তিনি বারবার স্মরণ করেছেন। জীবনের এই দিনগুলি স্মৃতি মেদুর হয়ে তাঁর মনকে বারবার আকর্ষণ করেছে। তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই এই গ্রামের কথা স্মরণ করেছেন। প্রায় শেষ বয়সে আত্মপরিচয় লিখতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন :

দেহ মোর শায়িত শহরে
মন মোর দূর্বাশ্যাম পল্লীতে বিচরে[৫]

শুধু 'আত্মপরিচয়' কবিতাতেই নয় লাজাঞ্জলি কাব্যের শৈশব সঞ্চয় কবিতায় কবি বলছেন কাব্য রচনা করতে বসে তিনি তাঁর তৎকালীন জীবন থেকে কোন উপাদান পেলেন না তাঁকে বাল্যস্মৃতি স্মরণ করে কবিতা লিখতে হল। সেজন্য 'আত্মপরিচয়' কবিতাতে তিনি যে বলেছিলেন - 'পল্লী মোরে লেখায় কবিতা' সে সত্যি। শুধু তাই নয় এই পল্লীর সঙ্গে কবির যে প্রথম পরিচয় তাই আজীবন তাঁর কবি চেতনাকে প্রভাবিত করে ছিল - তা হয়ে উঠেছিল

তাঁর কবি জীবনের একটি প্রধান চালিকা শক্তি। গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবার সময় গ্রামের সঙ্গে বিচ্ছেদের দুঃখে এই কিশোরের চোখে অশ্রুর প্লাবন এসেছিল। পরে সেকথা মনে করে তিনি লিখছেন :

> পল্লীর প্রকৃতিকে প্রাণের সহিত ভালবাসতাম
> তার কোল থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য এই অশ্রুপাত।[৬]

এই অশ্রুর সেচনে তাঁর অন্তরে কবিত্বের বীজ উপ্ত হয়।

> বাংলার পল্লী প্রকৃতির প্রতি মমতাই আমার কবিমন গড়ে
> তুলেছিল। তাই বিস্ফারিত হয়ে সারা বাংলায় ছড়িয়ে
> পড়ল।[৭]

কাশিমবাজারে থাকবার সময় তিনি তাঁর বাল্যের পল্লীকে খুঁজে পাচ্ছেন কেবল সেখানকার প্রকৃতির মধ্যে। তিনি লিখেছেন :

> নিসর্গের সহিত কবির যতটুকু আত্মীয়তা তাহা শিশুকবি
> শৈশবের দোলায় দুলিতে দুলিতেই লাভ করে। তাই যৌবনে
> কবির যে সকল রচনায় নিসর্গ মাধুরী পরিস্ফুট, তাহাদের
> উপাদান উপকরণ সবই শৈশবের সুপ্ত জীবনেই আহৃত
> স্মৃতিপুটে সঞ্চিত।[৮]

পল্লী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 'পর্ণপুট' থেকে 'সন্ধ্যামণি' পর্যন্ত তিনি অজস্র পল্লী কবিতা রচনা করেছেন। এই সব কবিতাকে মোহিতলাল 'খাঁটি বাঙালী প্রাণের বাংলা কবিতা'[৯] বলেছিলেন।

৩.

কবিশেখরের পল্লী কবিতা রচনার সূত্রপাত ঠিক করে হয়েছিল বলা যাচ্ছে না। তবে পর্ণপুট ১ম খণ্ড থেকেই এই পল্লীকবিতাগুলি সকলের চোখে পড়ল। পর্ণপুটের কবিতাগুলি আগেই

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। কবি তখন উলিপুরে শিক্ষকতা করেন। অর্থাৎ পর্ণপুট ১ম খণ্ড প্রকাশের কিছু আগে থেকেই এই পল্লী কবিতাগুলি রচিত হচ্ছিল। পর্ণপুটের অনেকগুলি কবিতায় (গ্রামপথে, পল্লীবালা, পল্লীবধূ, ভাদুরাণী এস ঘরে ইত্যাদিতে) পল্লীর কথা বলা হল। 'ঋতুমঙ্গল' যদিও ঋতুবর্ণনা তবু ঋতুবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কবি গ্রাম জীবনের সাধারণ পরিচয় দিয়েছেন। এতে পল্লীর প্রতি তাঁর মনোযোগের প্রমান আছে। 'পর্ণপুট' ২য় খণ্ডে কয়েকটি কবিতায় (পৃথক, লক্ষ্মী, পল্লীবালার ব্যথা, রাঙাচুড়ি) পল্লীর জীবন চিত্র পাওয়া যায়। তারপর ক্ষুদকুঁড়া কাব্যেও (ও পাড়ার রূপসী, গাঙীহারা, মজুরের গোহারী., মেছুনী, পাড়ার মেয়ে, গ্রামপ্রবেশ) পল্লী কবিতা পাওয়া গেল। 'লাজাঞ্জলি' কাব্যেও এই ধরণের কোন ছেদ পড়েনি। সেখানে 'বাল্যসখা' 'বৌদিদি', 'সুবোধ', 'বাপ পিতামোর ভিটে,' ভুতোবাড়ী', 'রাখাল' ইত্যাদি কবিতায় পল্লীর পরিচয় আছে। আহরণী কাব্যে পল্লীচিত্র এবং গার্হস্থ্য চিত্র নামে পল্লী কবিতার দুটি বিভাগ ছিল। কৃষিসঙ্গীত, লক্ষ্মীমাসে, কুড়ানী, বৌদিদি ইত্যাদি পূর্ববর্তী কাব্য থেকে সংগৃহীত। 'হৈমন্তী' কাব্যের মধ্যে কবির পল্লীপ্রীতি বেশ নিবিড় হয়েছে। গ্রামের প্রতি প্রানের টানে তাঁর এখানকার কবিতাগুলি অতিরিক্ত একটা স্বাদ বৈচিত্র্য পেয়েছে। প্রত্যাবর্তন, স্নানের ঘাটে, পল্লীশ্রী, পল্লীর বেদনা প্রভৃতি কবিতায় কবির এই প্রীতি পল্লীর সর্বাঙ্গ জুড়ে বিরাজ করছে। 'বৈকালী' কাব্যেও কয়েকটি পল্লী কবিতা আছে।

'আহরণ' সংকলন গ্রন্থে সংকলক তারাচরণ বসু কবিতাগুলিকে পল্লীপথে এবং গার্হস্থ্য জীবনে এই দুই ভাগে ভাগ করে সাজিয়ে ছিলেন। এখানকার কবিতাগুলি বিভিন্ন কাব্য বা পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলিত হয়েছিল। নূতন কবিতার মধ্যে 'পল্লীবধূ' ও 'বাংলার দীঘি' নেওয়া হয়েছিল 'ভারতবর্ষ' থেকে, 'কবির নিমন্ত্রণ' 'বঙ্গদর্শন থেকে', 'গৃহদীপ' 'ভারতবর্ষ' থেকে', 'পূজার দিনে' বসুমতী থেকে। 'সন্ধ্যামণি' ও একটি সংকলন গ্রন্থ, এখানে কবিতাগুলিও সংকলিত হয়েছিল নানা গ্রন্থ থেকে। এদের মধ্যে 'পল্লীসন্ধ্যা', 'রেলপথে', 'গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপ'

ইত্যাদি বিশিষ্ট। কবিশেখরের শেষ বিশিষ্ট কাব্য 'পূর্ণাহুতি'। এখানে 'পল্লীকিশোরী' 'ফসল-হারা ক্ষেত' 'প্রাচীনা' প্রভৃতি কবিতায় এই পল্লী জীবনের কথা আছে। কবির মৃত্যুর পর তাঁর 'দিন ফুরানোর গান' সংকলিত হয়েছে। এতে তাঁর অনেক পুরাতন ও কিছু নূতন কবিতা স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে আত্মপরিচয় বাল্যস্মৃতি, শরৎপ্রভাতে, প্রভৃতি কবিতায় পল্লী-পরিচয় আছে। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় কবি আজীবন পল্লীকে নিয়ে কতো ভেবেছেন।

কবির পল্লীকবিতার এই ধারাটিকে তিনটি দিক থেকে আমরা আলোচনা করতে পারি। ১. পল্লী চিত্র ২. পল্লীর প্রকৃতি ৩. পল্লীর গার্হস্থ্য চিত্র। এ তিনটির মধ্যে কোন জল অচল বিভাজিকা নেই। এরা একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে আছে। পল্লীর চিত্র বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে পল্লীপ্রকৃতি যথেষ্ট পরিমানে এসে যায়। এর মধ্যে আমরা পল্লীর সাধারণ পরিচয় তুলে ধরছি। সে পরিচয় কোথাও কবির ভালো লাগার দ্বারা কখনো বা পল্লী মানুষের সাধারণ জীবন বর্ণনার দ্বারা চিত্রিত। এর মধ্যে আমরা 'সাধারণ' ধর্মকেই ধরতে চেষ্টা করেছি। প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে এর যোগ ঘটেছে কোথাও কোথাও। জীবন পল্লী বর্ণনার মধ্যে প্রকৃতি অবধারিতভাবেই এসে গেছে। গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনা বোঝাতে আমরা সেই সব কবিতাকেই নিচ্ছি যেখানে কবি কোন বিশেষ গৃহস্থের জীবন চিত্র রচনা করেছেন। অবশ্য বিশেষ গার্হস্থ্য জীবন আর সাধারণ পল্লীজীবনকে অনেক সময় পৃথক করা যায় না। এই অসুবিধের কথা মনে রেখেও আলোচনার জন্য আমাদের এইরকম ভাগ করে নিতে হয়েছে। ড. প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলাকাব্যে পল্লীকবিতার ধারা' গ্রন্থে পল্লীর এই তিন প্রসঙ্গকেই এক সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি আবার কখনো কল্পনা ভক্তি ধর্মকেও এর মধ্যে ঢুকিয়েছেন। আমরা তেমন করিনি।

৪.

বাংলার পল্লীচিত্রগুলিকে দুভাবে দেখা যায়। কতকগুলি কবিতায় তিনি সামগ্রিকভাবে বাংলার রূপচিত্র রচনা করেছেন। এসব কবিতায় কবি নিবিড় মমতায় বাংলার পল্লীগ্রামগুলিকে

ছায়াঘন শান্তির নীড় হিসেবে দেখেছেন। এর পাশে কতকগুলি কবিতায় পল্লীর নানা বিষয়কে চিত্রিত করা হয়েছে। এইসব আপাত তুচ্ছ বিষয়গুলির ভিতরে কবি অপার আনন্দ লাভ করেছেন। এর কারণ এগুলির সঙ্গে কবির মন আছে জড়িয়ে। কবি গ্রাম ছেড়েছেন বহুকাল। কিন্তু তিনি শহরের মানুষ হতে পারেননি। তিনি গ্রামেই মানস জীবন যাপন করেন। শহরে বসেই গ্রামের সৌন্দর্য আস্বাদন করেন। কবির রোমান্টিকতা তুর মন নাগরিক জীবনের ক্লান্তির মধ্যে একটু শান্তির জন্য সেই গ্রামজীবনের স্মৃতি আশ্রয় করছেন। এই স্মৃতি আতুরতা বিশেষ করে দেখা যায় তাঁর হৈমন্তী কাব্য থেকে। হৈমন্তীকাব্যের 'প্রত্যাবর্তন' কবিতায় কবির মানস প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল। কবি গ্রামে ফিরে বলেছিলেন -

এ দগ্ধ হৃদয় মোর স্নিগ্ধ করি দিক তব
মুগ্ধ ঘনচ্ছায়ার প্রসাদ
পাখীর ডানার বায়ে বকুল ঝরুক গায়ে
অভাজনে কর আশীর্বাদ

এই কবিতায় কবি পল্লীর যে শ্রীময়ী রূপ রচনা করেছিলেন তা কবির নিজের বাল্যস্মৃতি দিয়ে গড়া।

তুলসী ছায়ায় শুচি লক্ষ্মীর চরণ আঁকা
এ অঙ্গনে তৃণের কুটীরে
বেণুকুঞ্জে দীঘিজলে ধেনুধন্য গোষ্ঠে তব
নদীটির তৃণাঙ্কিত তীরে
আবার ফিরিণু বুকে প্রীতি সুখে স্মৃতি সুখে
অঙ্গে মোর জাগে শিহরণ
বাল্যস্মৃতি দিয়ে গড়া প্রথম প্রণয়ে ভরা
চারিদিকে সকলি মোহন।[১০]

এর পাশে পল্লীর সৌন্দর্যের যে চিত্র কবি রচনা করছেন তা যেহেতু তার কাল্পনিক সৃষ্টি সেজন্য তাতে বিশেষ একটি জিজ্ঞাসার ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। এই জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে কবি তাঁর

স্মৃতিমেদুর পল্লীশ্রী ফিরিয়ে আনছেন -

তেমনি কি ফোটে হাঁ মা কাজলা দীঘির জলে
সাঁজে ভোরে কুমুদ কমল
দেশের পাখীরা এসে সেই বট শাখাকুঞ্জে
তেমনি কি ভুঞ্জে বটফল ? ...[১১]

এ চিত্রটি পল্লীর কলাচিত্র কবির মানস-সুরভি সুগন্ধিত। এর পাশে পল্লীর আরেকটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের দৃষ্টির উল্লেখ করি : সেটি 'হৈমন্তী' কাব্য থেকে নেওয়া 'পল্লীশ্রী' কবিতা। 'প্রত্যাবর্তন' কবির গ্রামে প্রত্যাবর্তনের চিত্র কিন্তু 'পল্লীশ্রী' কবিতায় কবি যেন শান্তির নীড় সন্ধানে কেবল পরিভ্রমণ করে চলেছেন। রচনাকালের উল্লেখ নেই বলে নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয় কোনটি আগে লেখা। তবে মনে হয় ভাবের দিক থেকে 'পল্লীশ্রী' প্রথমে স্থান পাবার যোগ্য। কবির স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি তিনি কৈশোরে পথের আনন্দে বিভোর ছিলেন। এখন তার পথ থেকে পথপ্রান্তে যাবার ইচ্ছা। পল্লীশ্রী কবিতায় দেখি পরিভ্রমণকারী কবির নৌকো একটি গ্রামের কাছে এসে থেমেছে আর কবি "মায়ামুখ সজল নয়নে" গ্রামটির সৌন্দর্য অবলোকন করছেন।

পথখানি জল থেকে ছলিয়াছে এঁকে বেঁকে
আশ্রবণ হইয়াছে পার
ঘট কাঁখে আসে বঁধু নবযুকুলের মধু
বিন্দু বিন্দু ঠোঁটে পড়ে তার।[১২]

কবি দেখছেন -

যতদূর দৃষ্টি ধায় নয়ন জুড়ায়ে যায়
তরঙ্গিত শ্যামল উচ্ছ্বাস।

তাঁর চোখে পড়ছে গ্রামীন জীবনের ছবি। শান্ত প্রকৃতি চিত্র, গ্রামের মন্দির। পল্লীমানুষের জীবন ও তার নিসর্গ দৃশ্য কবিকে রসতৃপ্ত করেছে। তাই কবি বলছেন -

মনে হয় এত দিনে বসতি ফেলেছি চিনে
ধন্য হই এই নদীতীরে
জীবন কাটায়ে দিতে পারি যদি এ নিভৃতে
ছায়াচ্ছন্ন একটি কুটীরে
তরী যাত্রা হয় শেষ শান্ত হয় সব ক্লেশ
বন্ধ হয় সকল সন্ধান
নগরের হট্টগোলে ক্লান্ত হয়ে মার কোলে
ফিরে আসে মায়ের সন্তান।[১৩]

'ছায়া' কবিতায় পল্লীর ছায়াসুশীতল বৃক্ষতল কবিকে আকৃষ্ট করেছে, হাতছানি দিয়ে যেন তাঁকে ডাকছে।

পথপাশে ছায়াখানি দিয়া যেন হাতছানি
ডাকে ফিরে দেহ মোর টানে[১৪]

৫.

এই কবিতাগুলিতে পল্লীর শ্রীময়ীতা বর্ণনার পাশাপাশি কবি আরো কতকগুলি কবিতায় পল্লীর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। পল্লীর পথ, পল্লীর সত্তার মাধুর্য, পল্লীর দীঘির অতল গভীর শান্তি, গ্রামের ষষ্ঠীতলা চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রামের মানুষের জীবনধারণের নানা রূপ চিত্র কবির এই সব কবিতায় ফুটে উঠেছে। মনে রাখতে হবে পল্লীর মানুষের জীবনে তথাকথিত সুখের বড় অভাব। গ্রামগুলি অর্থনৈতিক ভাবে প্রায় নিঃস্ব। অধিকাংশ মানুষের জীবনই নানা দুঃখে আর দারিদ্র্যে জর্জরিত। জীবন ধারণের সাধারণ সুখ সুবিধাগুলিও পাওয়া যায় না। তবু কবি মনে করেন এই মানুষগুলির জীবনে যে একটা শান্তির অন্তঃশীল স্রোত বইছে। সেটা অনেকটাই কবির কল্পনার জগৎ বলেই কবি সেখানেই শান্তির সন্ধান পান। এখানে এই সব কবিতার পরিচয় দিই :

গ্রামের পথের পরিচয় কবির 'গ্রামপথে', 'শরতের গ্রামপথে', 'মেঠোপথ', 'বিদ্যালয়ের পথে' প্রভৃতি কবিতায় আছে। 'গ্রামপথে' কবিতায় কবি লিখছেন :

কোন কাজে মন লাগে না জ্বর আসে আজ কাজের নামে
নগর ছেড়ে গেলাম চলে বেড়াতে তাই একটি গ্রামে।[১৫]

এ বক্তব্য থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় গ্রাম কবিকে মানসিক ক্লান্তি থেকে মুক্ত করতে পারে। সেখান থেকে তিনি মৃতশক্তি নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারেন। 'শরতের গ্রামপথে' কবিতায় কবি এই গ্রামপথের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন -

খালি পায়ে আলিপথে চলিয়াছি দ্রুত
জন্মভূমি জননীর স্নেহ সম্ভাষণ খানি হয় অনুভূত।[১৬]

কবি গ্রামের পথে হাঁটতে গিয়ে জননী জন্মভূমির স্নেহ অনুভব করছেন। সন্দেহ নেই এ স্মৃতি রোমাঞ্চিত। কবির বর্ণনা -

দুধারে ধানের শীষ নুয়ে নুয়ে লীলাভরে করে পথরোধ,
ঠেলিয়া চলিতে গায় কোমল পরশ পাই হয় সুখবোধ।
মেঠো পুকুরের কোনে ঢেউ খেলে কাশবনে, জাগে বাল্যস্মৃতি
অমনি দুধের ঢেউয়ে দুলিয়া শুনেছি ঘুম-পাড়ানিয়া গীতি।[১৭]

এই বর্ণনার সৌন্দর্য কবির মতো আমাদের মনেও পল্লীর দূরস্মৃতির অনুভূতি নিয়ে আসে। ছন্দে সুরে আর শব্দের মাধুর্যে কবির বর্ণনা রূপময় হয়ে ওঠে। মনে পড়ে কবি 'বিদ্যালয় পথে' কবিতায়ও তার কৈশোরের পথযাত্রাটিকে অমর করে রেখেছেন -

বাবলা ফুলের গন্ধে সেই পথখানি পড়ে মনে।[১৮]

সেই পথ রাঙাচিতার বেড়া দিয়ে ঘেরা আর তার -

বাঁ পাশে বিলের জলে ফুটে আছে কুমুদ কমল
ডাহিনে বেণুর কুঞ্জে বায়ু ভরে করে টলমল।[১৯]

'ত্রিপথ' কবিতায় কবি তাঁর বাল্যের পথচিত্র স্মরণ করছেন -

বাল্যে ছিল পথটি কাঁচা ধূলা কাদায় ভরা
খাঁটি রাঢ়ের মাটি দিয়ে গড়া।
পল্লীমাটির পরশ পেতাম সেথায় অনুক্ষণ
সে পথ দিয়ে রাখাল যেত সঙ্গে ধেণুগণ
ছিল সে পথ ভরা ছায়ায় ঝরা পাতায় ঢাকা
ধরত মাথায় সবুজ ছাতা তরুগুলির শাখা।[২৫]

বলাবাহুল্য এ যেমন স্মৃতিচিহ্নিত তেমনি রোমান্টিক কবির মনের রঙে রঙীন।

'রেলপথে' কিন্তু এরকম খণ্ডিত পথ নয় তা পল্লীর পথবর্ণনাও নয়। তার মধ্যে আছে কবির জীবনভাবনার পরিচয়। প্রৌঢ় কবির মনে একটা দার্শনিক অনুভূতির উদয় হয়েছে। কবি রেলপথে যেতে যেতে দেখছেন পথের দুধারে ফুলের মেলা বসেছে।

যত বুনো ফুল নানান রঙের তারা
অবিশ্রান্ত ফুটেছে তাদের ধারা।[২৬]

এই ফুলগুলি লোহা পাথরের পথের দুধারে ফুটেছে কেউ তার সৌন্দর্য উপভোগ করছেনা। মনে হচ্ছে তিনি সারা জীবন এমনি করে লোহা পাথরের পথে চলতে চলতে সহজ সৌন্দর্যের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেননি। প্রকৃতিমাতার দান উপভোগ করতে পারেননি। এই 'কুসুমোৎসবে' যোগ দেবার সুযোগ তাঁর হল না। এ ঠিক পল্লীর পথচিত্র নয়, কবির জীবনদর্শন।

পল্লীর পথের মতো পল্লীর দীঘির অতল গভীর শীতলতা কবিকে মুগ্ধ করে। 'শরতের গ্রাম পথে' কবিতায় 'কঙ্কন কল কলস ঝঙ্কৃত' এই দীঘির বর্ণনা ছিল। 'বাংলার দীঘি' কবিতায় 'দিনান্তদাহ হরা' পল্লীদীঘির কল্প চিত্র পাই :

বাংলার দীঘি শ্যামল শীতল কবির স্বপ্নে গড়া
চাঁদে চাঁদ মুখে - অমল কমলে কমল নয়নে ভরা
ঘটে ঘটে ভরি সুশীতল প্রীতি
ঘরে ঘরে তুমি পাঠাইছ নিতি
তোমার সলিল পরম শরণ বিরহ বেদনা হরম।[২৭]

এই দীঘির বুকেই জাগে গ্রামের দিন আর রাত্রি -

ডুবিয়া বিদায় লয় তব বুকে পল্লীর দিনগুলি
তোমা সম্ভাষে হাসি উষা আসে পূর্ণ দুয়ার খুলি।[২৮]

কবি এই দীঘিকে বাংলার সৌন্দর্যের রূপময়ী প্রতিমা করে এঁকেছেন। কবি বলছেন -

সুন্দর তুমি, হরি তরুণীর লাবণ্য শতদলে
অথবা তোমারি লাবণ্য তার তনুতটে উছলে।[২৯]

বাংলার দীঘি পল্লীচিত্রের সাধারণ বর্ণনা। আর হৈমন্তী কাব্যের 'স্নানের ঘাটে' কবিতায় কবির সঙ্গে এই দীঘির স্মৃতিমেদুর পরিচয় :

বহুদিন পরে গ্রামে ফিরে এসে
নাইতে গেলাম দীঘির জলে
বসিনু ক্ষণেক লাল করে ভরা
শৈশব-সখা বটের তলে।

কবির মনে বাল্যস্মৃতির উদয় হল -

ফুটিল মানসে বাল্য-স্বপন
বিশ বছরের পঙ্ক ঠেলি
মনে পড়ে গেল ছেলে বেলাকার
এই দীঘি জলে মরাল কেলি।[৩০]

কবি আজ প্রৌঢ়। কিন্তু তিনি স্মৃতি তাড়িত হয়ে এই দীঘির স্নানের ঘাটে তার বাল্যকৈশোর জীবনের লীলাকে ফিরিয়ে আনছেন।

পশ্চাতে ফেলি সব লীলা-কেলি
কিশোর সুদূরে চলিতে থাকে
পিছুপানে চায় করে হায় হায়
লীলা যেন হাতছানিতে ডাকে

কবি বলছেন মানুষ চলে যায় কিন্তু লীলা ফুরায় না

যে যায় সে যায় লীলা না ফুরায়
তার উৎসব সমানই চলে।[৩১]

এ যে কবির লীলা সম্ভোগ কবি নিজেই সে কথা বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ এসবই প্রৌঢ় কবির বাল্যলীলা স্মরণ করে জীবনে কিছু আনন্দের সন্ধান করা।

পল্লীর পথের দীঘি পার হয়ে কবি এবার গ্রামে পৌঁছে যান সেখানে "একে একে চেনা মুখ" গুলি তার মনে পুলক সঞ্চার করে। কবির 'গ্রামপথে' কবি তার অংশ বিশেষ আবার এখানে স্মরণ করি। কবি গ্রামের পথে চলতে চলতে দেখতে পাচ্ছেন গ্রামীন মানুষের কর্মের ছন্দ এবং সুর। যে দৃশ্য তিনি নগর জীবনে পাননি বলে তাঁর কেবল ক্লান্ত লাগে এই সুর-এর ছন্দ তিনি গ্রামীন মানুষের জীবনে দেখতে পেয়ে যান -

পথে যেতে শুনতে পেলাম ছাত পিটানো ধুনির সাথে
গলা ছেড়ে গান গেয়ে সব রাজ-রাজারা হর্মে মাতে।

শুধু গান নয় কবি নাচও দেখেছেন। করাতীরা নেচে নেচে কাঠ চিরছে, মজুরেরা নেচে নেচে কাদা মানছে,

বাঁয়ে দেখি বেড়ার ফাঁকে নাচছে বধূ ঢেকির পরে
কাজ আজি তার নাজ হয়েছে গোট দোলে তায়
তার কোমরে। ...

পথের বাঁকে দেখছি কাঁখে ভরা কলস কাঁকন বাজা
পল্লীবধূ চলছে নেচে ঘোমটা মাথার দুলছে মাজা।[৩২]

কবি সহজ গ্রাম জীবনের এই সুর আর ছন্দ থেকে নিজের জীবনকেও নন্দিত করতে চান।

'দিন ফুরানোর গান' কাব্যের 'গ্রাম প্রবেশ' কবিতায়ও দেখি গ্রামের মানুষের কাজের ছন্দ কবিকে মুগ্ধ করেছে। কবি এবার গ্রামে ঢুকে পড়েছেন। দেখছেন 'গ্রামের ষষ্ঠীতলা' গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ, । গ্রামের ষষ্ঠীতলা ' বা 'গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের উপরে সব মানুষের সমান অধিকার। 'গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ'-এ সেই চণ্ডীমণ্ডপের সাধারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কবিতাটি বস্তুরস প্রধান রচনা। 'ষষ্ঠীতলা' কবিতায়ও একই ভঙ্গিতে সর্বসাধারণের পূজাক্ষেত্র-টির বর্ণনা করা হচ্ছে -

গ্রামের শেষে অশথ বটে জড়ায় দোঁহে দোঁহার গলা
গাঁয়ের তীর্থ উহার তলে - ওটা মোদের ষষ্ঠীতলা।
গাঁয়ের মায়ের দেবতা হেথায় সিঁদুর মাখা পাথর খানি
উহায় ঘিরে কমলকলি রচে হাজার কোমল পাণি।

এদুটি পল্লীর গ্রামসংস্কৃতির বিবরণ ধর্মী রচনা। কবি এখানে যথাযথ বস্তুচিত্র তুলে ধরেছেন।

গ্রামের বর্ণনা থেকে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার চিত্রে এবার ঢুকে পড়া যায়। অনেকগুলি কবিতায় কবি পল্লীর মানুষের সহজ জীবনের চিত্রআন্তরিক ভাষায় রচনা করেছেন। 'পল্লীবধূ' কবিতায় পল্লীর নিতান্ত দরিদ্র এক বধূর সাধারণ জীবনচিত্র কবি এঁকেছেন। এই পল্লীবধূর গর্ব করার মতো কিছু সম্পদ বা ভূষণ নেই, আছে শুধু 'দুটি শাঁখা' আর সীমন্তভরা 'উজ্জ্বল সিঁদুর'। তবু কবি মনে করেন -

তৃপ্ত পতিপ্রেমে দৃপ্ত লাবণ্য ও দুটি চরণ
ধরিয়া ধরণী ধন্য - অঙ্গে তার জাগে শিহরণ [৩৪]

এই পতিগৌরবে গৌরবিনী নারীকেই কবি এ কবিতায় পল্লীজীবনের সহজ আদর্শ প্রকাশ করবার দায়িত্ব দিয়েছেন। পল্লীজীবনের আর একটি ছবি আছে তাঁর 'লক্ষ্মীমাসে' কবিতায়। এটিও সমাপ্নতার চিত্র। প্রথম কবিতাটিতে কবি পল্লীনারীর ভাব সম্পন্নতা দেখিয়েছেন দ্বিতীয়টিতে একেছেন বাস্তব সম্পদের চিত্র। পৌষমাস বাঙালীর ঘরে লক্ষ্মীমাস। তখন সবার বাড়িতে নূতন ধান ওঠে। সেই সম্পদের ছবি -

আজকে আমার ভরেছে খামার সোনার বৈভবে,
ধূপ ধূনা জ্বালো শঙ্খ বাজাও ছড়াও খৈ সবে।[৩৫]

এই পূর্ণতার চিত্র আছে সংসারের নানা সাধ মেটাবার সুখে কবি গ্রামের মানুষের নিত্য দুর্দশা ঘুচিয়ে তাঁকে লক্ষ্মীমাসে সুখে বিভোর করে রেখেছেন। 'কত কি যে সুখ-স্বপনে গোপনে রেখেছি জাল বুনে' - তার হিসেবও দিয়েছেন। এর আর একটি রূপ আছে 'পৌষের গান' কবিতায়।

এলো ফিরে পৌষমাস আষাঢ়ের জমি চাষ
শাওনের ভাদরের যত আশ ফললো।
সবুজে সে হলো সোনা যত বীজ হলো বোনা
শত শত হয়ে তারা গাঁয় গানে চললো।[৩৬]

চারিদিকে পূর্ণতা আর আনন্দের ছবি -

চারিদিকে কল হাসি ধান কেটে যায় চাষী
ফাঁকা মাঠে একে একে ভরে উঠে ধেনুতে
মিঠে রোদে সারা বেলা রাখালেরা করে খেলা
গাছতলে কৌ কৌ তান ধরে বেণুতে॥

কৃষাণীর সংসারে খুশী আর আনন্দের চিত্র -

কৃষাণীরা ভাজে খই বাঁধে নাড়ু পাতে দই
সকলেই খুব খুশী মওয়া আর পায়েসে।

সারা বছরের পরে অভাব ঘুচেছে ঘরে
পৌষ মাস কাটে বেশ হেসে খেলে আয়েসে॥

যার মুখে তখন মিষ্টি কথা, ঘরে আলপনা আর লক্ষ্মীর পাদপদ্ম আঁকা। আনন্দ আর পূর্ণতার এই চিত্র রচনার সঙ্গে করি মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথাটিও বলেছেন - " গায় সবে পৌষ মাস তাড়াতাড়ি যেও না"[৩৭]।

৬.

কিন্তু পল্লীর জীবন তো শুধু শ্রীময়ীতা আর সম্পন্নতার ছবি নয়, কবি যে শান্তির আকাঙ্ক্ষায় পল্লীকে ছায়া সুশীতল করে দেখেন তাও নয়। কবি তা জানেন। তিনি অনেক কবিতায় পল্লীর দারিদ্র্য, বেদনা, হতশ্রীতার বর্ণনা দিয়েছেন। যে পৌষ মাসে গৃহস্থেরা সকলেই খুশী তখন কুড়ানির দিন কাটে 'শামুকের খোলে চূর্ণ ধান খুঁটে খুঁটে' মজুরের গোহারি চলে মজুরিটা ঠিক পাবার জন্য কেন না তার 'শাক ভাত নুন তাই জোটে না'[৩৮] ভরা ভাদ্রে 'ভিখারী কাঙাল আছে আজি উপবাসে'[৩৯]। যে পল্লীবধূ শাঁখা সিঁদুরে গরবিনী, পুরানো পাথর বাটির একটি কোনা ভেঙে ফেলবার অপরাধে শাশুড়ীর সম্ভাব্য গঞ্জনার ভয়ে সে কাতর -

দুইটি টুকরা জোড়া দিয়ে বধূ অঞ্জলি পুটে ধরি,
ঝাপসা চক্ষে চেয়ে আছে আহা মুখখানি নত করি।
হেরিছে অভাগী জমা লাঞ্ছনা বাটির মুকুর পুটে,
অন্ন খাবার বাটিটি ক্রমেই লোনা জলে ভরে উঠে।[৪০]

'মুখরা'[৪১] কবিতায় আছে এরকম একটি পল্লী রমণীর দুঃখময় জীবন চিত্র। জীবনে যে কারো স্নেহ পায়নি করুণা পায়নি। এই কিছুই না পাওয়ার দুঃখ তার আচরণের মধ্যে ফুটে বেরোচ্ছে।

'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতায় কবি এই বাঙলাদেশের কাঙাল রূপের চিত্র রচনা করেছেন। কবিতাটিতে কল্পিত বঙ্গ পল্লীর জায়গায় বাস্তব পল্লী জীবনের চালচিত্র ধরা আছে।

এস মা লক্ষ্মী ফিরিয়া আবার কাঙাল লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে
রান্নাঘরের কান্না থামাও, এস মা শূণ্য ভাঁড়ার ঘরে।
সন্তান তব ডিখ্ মেগে খায়, অন্নের দায়ে চা বাগানে যায়
কাঠ পাতা কুটো গোবর কুড়ায় মাঠে জঙ্গলে পেটের তরে।[৪২]

পল্লী বাংলার প্রকৃত চিত্র :

চালে নেই খড় চুলোয় আগুন নাই দীঘি খাল পুকুরে জল
মরায়ের তলা যেন ভাঙা বেদী খামারে আসে না হাঁসের দল ...

গো ভাগাড়ে চলে শুধু উৎসব শকুনির বড় ভাগ্যসুখ
নিঃস্বের ঘরে শস্য না পেয়ে ঢেঁকির মুষল ভাঙিছে বুক।[৪৩]

কবি দেখছেন সাম্প্রতিক বাংলার পল্লীগ্রামের দুর্দশা

শূন্যবাথান বসে নাক হাট ঘুরে নাক ঘানি চলে নাক যাকু[৪৪]

আর মানুষের সে আনন্দও নেই -

খেয়ে গেছে দোল বাজে নাক খোল চড়ক গাজনে নাই সে ধুম
রাঙাশাড়ী গায় পরায়ে পূজায় মেয়েরে মা আর দেয় না চুম।
পৌষ পার্বনে নাহি পিঠে পুলি শিশুমুখে নাই হাসি মিঠে বুলি
জুটে নাক শাঁখা নালসুতা শুধু সধবা চিহ্ন ধরে।[৪৫]

বাংলার গ্রামগুলি আজ হতশ্রী। গ্রামের জীবন আজ নানা বিড়ম্বনার লাঞ্ছিত এই শ্রীহীনতার কারণ নির্ণয় করেননি কবি। তবে তাঁর লেখায় তার নানা ইঙ্গিত আছে। প্রথম কারণ গ্রামের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। নগরই এখন হয়েছে জীবন ও জীবিকার কেন্দ্র। গ্রাম ছেড়ে রুজি রোজগারের প্রয়োজনে অনেকে শহরে চলে যাচ্ছেন। 'পল্লী থেকে নগরে' কবিতায় কবি বলেছিলেন :

ছায়াচ্ছন্ন বনকুঞ্জে সংস্করণ কিংবা রোমন্থন
পরিহরি যেতে হবে মানুষের ভিড়ে
কর্মবতী তীরে[৪৬]

গ্রাম ছেড়ে যাবার ফলে গ্রামগুলি এখন পরিত্যক্ত, আর বৃহৎ শিল্পের প্রসারের ফলে গ্রামের অর্থনীতিতে আর পুরোন তিলি তাঁতী কুমোর মুচির জীবিকার ক্ষেত্র বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গ্রামে জমেছে জীর্ণ পুরাতন বাড়ি। একদিন এই বাড়িগুলি কতো আনন্দে মুখরিত থাকতো। আজ কেবল সেই সব স্মৃতি নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

আজি সব স্মৃতি সার বৃথা আর কার তরে শোক
যারা ছেথা সুখে ছিল তারা আজ নগরের লোক
উড়ে গেছে পারাবত চামচিকা করিছে চীৎকার
চলিয়া গিয়াছে লক্ষ্মী রেখে গেছে পেচকেরে তার।[৪৭]

কবি অবশ্য অর্থনীতিকে কখনো তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রে আনেননি। তবু দেখছি তিনি এই গ্রামের কামার, কুমোর তাঁতীর মুচির জীবিকা ভেঙে পড়বার কথা বলছেন 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতায়।

শূন্য বাথান বসে নাক হাট ঘুরে নাক ঘানি চলে না যাকু
কুমোরের চাক ঘায় নাক পাক চলে না চরকা ঘুরে না টাকু
কামারশালের ফুসফুসগুলি নিশ্বাস বায়ে উঠে নাক ফুলি
জাহাজীপণ্যে বাজার ভরেছে তোমার ছেলেরা না খেয়ে মরে॥[৪৮]

এখানে স্পষ্টই দেখছি বাংলার গ্রামীন অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে বিদেশি পণ্য আমদানি হবার ফলে। কবি সেকথা বলছেন। তার উপরে এজমালি জমি 'পৃথক' হবার ফলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তাতে আর্থিক দীনতা বেড়েছে। কবি অবশ্য পৃথক হবার মানসিক কষ্টটাকেই দেখাচ্ছেন। বলছেন দুটি বিচ্ছিন্ন সংসার কাটা পেঁপের দুটি ফালির মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কেবল মর্ম-পীড়া জানাচ্ছে। কিন্তু এও বাংলার সুখ শান্তি নষ্ট হবার, প্রাচীন, উৎসবগুলি বন্ধ হয়ে যাবার একটা কারণ।

৭.

কবিশেখরের কাব্যে অনেক জায়গায় পল্লীপ্রকৃতির বর্ণনা আছে। কবি বলেছিলেন নিসর্গের সঙ্গে তার ঐক্য ও বিরহেই তাঁর মনে কবিত্বের বীজ উপ্ত হয়েছিল। তিনি গ্রামের জীবন ও প্রকৃতি থেকেই তাঁর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। তাই হয়েছিল তাঁর সম্বল।[৪৯]

গ্রাম ছেড়ে কাশিমবাজারে গিয়ে গ্রামের "বাঁশঝাড় পানাপুকুর ধূধূ করা তরুহীন মাঠ, শীতকালে ফসলের ক্ষেত চীনে করবী কুড়চি আকন্দ"[৫০] ফুলের জন্য তাঁর মন কেমন করত। তবে কাশিম বাজারেও ছিল প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্য। স্মৃতি কথায় সে কথা আছে।

> সব চেয়ে মনে পড়ে বসন্তের কাশিমবাজার। চতুষ্পাঠীতে পঠিত সংস্কৃত কাব্যের বসন্তকে কাশিমবাজারে দেখিতাম তাহার স্বরূপে। কাশিমবাজারের আকাশ ফাল্গুনে শিমুল পলাশ অশোক ফুলে এবং রক্তবর্ণ বাদাম পাতায় লালে লাল হইয়া যাইত। অবিশ্রান্ত ভ্রমর গুঞ্জনে কাশিমবাজারের মুখরিত হইয়া উঠিত। ... সহস্র সহস্র পক্ষীর কলকাকলীতে বনভূমিতে মহামহোৎসব লাগিয়া যাইত। নাম না জানা ফুলে ফুলে বনপথের দুই ধার ভরিয়া যাইত। ... বসন্তশ্রী দর্শনে আমার কিশোর হৃদয় অকারণ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত।[৫১]

এখানে কবির প্রকৃতি প্রীতির মুখ পরিচয় আছে। তাঁর 'বিদ্যালয় পথে' কবিতায় সেই প্রকৃতি বর্ণনা আমরা পাই। কবি তাঁর কাব্যে শুধ প্রকৃতি বর্ণনা খুব বেশি করেননি। স্বাধীন প্রকৃতি বর্ণনার চেয়ে পল্লীর জীবন বর্ণনা তঁর কাব্যে মুখ্য স্থান জুড়ে আছে। তারই মধ্যে এসেছে পল্লীর প্রকৃতি প্রসঙ্গ। মঙ্গলকাব্যের কবিতাগুলিতে ঋতুনির্ভর প্রকৃতি চিত্র এবং তার সঙ্গে মানুষের কথা আছে। তবে সেগুলিতে প্রায়ই আছে সংস্কৃত কবিতার ভাবানুসরণ। কবি কালিদাসের ঋতুবর্ণনাগুলির ভাবানুবাদ করেছেন অনেকগুলি কবিতায়। যেমন 'নিদাঘ,' 'কালিদাসের বর্ষা,' 'শরৎ,' 'হেমন্ত,' 'বসন্ত,' 'শিশির ঋতু,' প্রভৃতি কবিতায় এই ঋতুবর্ণনা

পাওয়া যায়। এসব কবিতায় যে প্রকৃতি তা সংস্কৃত কাব্যানুশাসিত। সেখানে কবিশেখরের স্বাতন্ত্র্য নেই। যেমন 'ঋতুলক্ষ্মী' কবিতায় কবি লিখছেন :

হস্তে তোমার নীলারবিন্দ কুন্দ অলক পরে
লোধ্র পরাগে গন্ড তোমার পান্ডুর শোভা ধরে
চূড়া পাশে তব নবকুরু বক, শ্রবণে শিরীষ দুল,
চারু সীমন্তে পুলকাঙ্কিত শোভে কদম্ব ফুল।[৫২]

এ বর্ণনা কালিদাসের। কবি নিজেকে যদিও 'আষাঢ়ের কবি' বলে অভিহিত করেছেন[৫৩] তবু তাঁর কাব্যে আষাঢ় রূপময় হয়ে ওঠেনি। 'বৈশাখী সন্ধ্যায়'[৫৪] কবিতায় বৈশাখের পিঙ্গল জটা বর্ষণে বিগলিত হয়ে নেমে আসেনি কাব্যে। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'[৫৫] কবিতায় তিনি কবি কালিদাসের বন্দনা করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃতি বর্ণনায় কবির আগ্রহ কম। তিনি বরং পল্লীর জীবন বর্ণনায় বেশি আনন্দ পান, সেখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। মনে হয় শুধ প্রকৃতি বর্ণনার জন্য কল্পনাশক্তির যে নিবিড়তা প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না। প্রকৃতি বর্ণনার জন্য চাই প্রকৃতি দর্শনের ক্ষমতা, তাকে অনুভব করে কবিতায় রূপান্তরিত করবার শক্তি। কবিশেখরের কাব্যে এই শক্তির পরিচয় কম। শুধ কল্পনার শক্তির দ্বারা অরূপকে রূপময় করবার চাইতে বাস্তবের বর্ণনায় তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। সেজন্য কবিশেখরের কবিতায় বর্ণনা বা বিবরণধর্মিতা বেশি। কৃচিৎ কখনো দু একটি ক্ষেত্রে প্রকৃতি চিত্র তাঁর হাতে ফুটেছে ভালো। যেমন 'পর্ণপুট' ২য় খন্ডের 'লুকোচুরি' কবিতায়। পর্ণপুটের আলোচনায় তার উল্লেখ করা হয়েছে। 'মেঠো পথে' কবিতায় কবি অন্ধকারের রূপ রচনায় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সে কবিতার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'শ্রাবণ পূর্ণিমা' কবিতায় কবি শ্রাবণ পূর্ণিমার বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু সেখানেও তার রূপ বর্ণনায় কবি যেন কুন্ঠিত। ক্ষুদ্র দশপদীটি থেকে একটু উদ্ধৃত করি -

তরল তন্দ্রায় যেন তব ম্লান চন্দ্রালোকে
নীলাম্বর হেরিছে স্বপন
লুকোচুরি খেলা করে তোমার অঞ্চলতলে
প্রকাশ গোপন[৫৬]

এখানেও শ্রাবণ পূর্ণিমার রূপ কিংবা আত্মার প্রকাশ কুণ্ঠিত। 'হৈমন্তী'কাব্যের 'হেমন্তে' [illegible] কবিতায় হেমন্তের রূপচিত্রণ আছে।

এলো হিম ঋতু লয়ে গিরি শিরে সিতিমা
পাণ্ডুতা লয়ে বনে লোধ্রে
পুষ্ট শালির শীষে লয়ে জরা পীতিমা
পিঙ্গল করি হেম রৌদ্রে।[৫৭]

বরং সে তুলনায় যেখানে তিনি বাংলার পল্লী প্রকৃতি চিত্র রচনা করছেন সেখানে তার সিদ্ধি ঘটেছে। যেমন 'ভাদ্‌রাণী এস ঘরে' কবিতায় কবি বর্ষার পল্লীপ্রকৃতির বর্ণনা করছেন। সে বর্ণনা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেওয়া :

নিভায়ে তপন ভাদর গগন ঢেকে গেছে মেঘে মেঘে,
সঘনে গরজি বিজলি চমকে ভ্রূকুটি হানে সে রেগে। ...
টোপর পানায় পুকুর ভরেছে কোন খানে নাই ডাঙা
জলা বলে মনে হয় ডাঙাগুলা জল মনে হয় ডাঙা। ...
ঘন বাড়ন্ত আখের পাতায় আলিপথ গেছে ঢেকে
কাঁকড়া শামুক মাছ ব্যাঙে ভরা নালী গেছে এঁকে এঁকে।[৫৮]

বর্ষার এই চিত্র বর্ণনায় কবি অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। সে তুলনায় 'বর্ষার রূপ'[৫৯] কবিতায় বর্ষার রূপ ফোটেনি। কবি সেখানে নগরে বসে গ্রামের বর্ষার সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করছেন। কবির শরতের বর্ণনা -

শরৎ প্রভাতে রাজে মাঠ ভরি উজ্জ্বল স্বপন,
শ্যামল তরঙ্গে নাচে শরতের তরুণ তপন।
শস্যগর্ভ সুচিক্কন গাঢ়শ্যাম ধান্য তৃণদল
নিবিড় পীবরগুচ্ছে পুলকিত পরম চঞ্চল [৬০]

'শরতের গ্রামপথে' কবিতায় পল্লীপ্রকৃতির বর্ণনা আছে। কবি শরতের রূপ বর্ণনার পরিবর্তে শরতের গ্রাম বর্ণনা করছেন। কবি দেখছেন -

চিকন ধানের ক্ষেতে শরতের রোদখানি পিছলিয়া পড়ে
ছাতিম তলার ছায়ে যাইতে মাথার গায়ে ফুলদল ঝরে [৬১]

'শরতের আবাহন' কবিতায় শরতের রূপ এর চেয়ে খুলেছে ভালো -

ফিরে এসো পুন সোনালী শরৎ ভাদর শেষে
মেঘলা আঁধার করিয়া বিদার মধুর হেসে
উজ্জ্বল শুচি ধবল বেশে

ফিরে এসো পুন ভাসায়ে গগন জোছনা বানে
ফিরে এসো পুন হাসায়ে ভুবন আশার গানে
করবী ফুলের সুরভি ঘ্রানে। ...[৬২]

কবি শরৎ বর্ণনায় তার আলোর শুচি শুভ্রতার উপরে নজর দিয়েছেন -

এসো ঝিলিমিলি রোদের খেলায় পাতার ফাঁকে
এসো ঝিকিমিকি রাতুর বেলায় বকের ঝাঁকে
সচকিত চখা চখীর ডাকে। [৬৩]

'শরতের গান' কবিতায় বঙ্গে শরতের চিত্র আছে।

বরিষাগতে মরাল রথে শরৎ এলো বঙ্গে [৬৪]

আর তাই -

ফুটিল আজি কমলরাজি কান্তানন তুল্য
অরুণাধরে হাসিটি তার শেফালি বনে ফুল [৬৫]

কবি বাংলাদেশের শরৎশোভা এ কবিতায় বর্ণনা করেছেন।

পল্লী কবিতাগুলির মধ্যে 'পল্লীবধূ'তে পল্লীর সন্ধ্যাদৃশ বর্ণনা আছে -

উড়ে যায় বকপাঁতি নীলাকাশে সন্ধ্যাতারা জাগে
পশ্চিম দিগন্তসীমা রঞ্জিত এখনো সন্ধ্যারাগে,
শিরীষ শাখায় পিক মুহুমুহু হানে কুহুরব
ফুটেছে বাতাবিফুল আসে তার মধুর সৌরভ। [৬৬]

কবি ফুল নিয়ে অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন। এদের মধ্যে চম্পক, জবা, মালতী, কদম্ব, অশোক, চূতমঞ্জরী, কর্ণিকার, ছাতিম, ধুতরা, কেতকী, শেফালি কমল, সূর্যমণি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ফুলের সঙ্গে চীনে করবী, দ্রোণ পুষ্প ইত্যাদির বর্ণনা আছে। প্রসিদ্ধ ফুলগুলির বর্ণনায় কবি তাদের রূপচিত্র রচনার চেয়ে অতীত কাহিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ রচনার বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন 'জবা' কবিতায় বলছেন জবা -

যুগে যুগে পুঞ্জিত জীব-বলি শোণিমায় রঞ্জিত বেদনায় ফুল্ল
বঙ্গের অঙ্গনে গঙ্গার তীর বনে রুদ্রের রোষ রাগ-তুল্য। [৬৭]

'কদম্ব' কবিতায় কবির মনে "পুরাজীবনের কতনা স্বপ্ন গুঞ্জরি উঠে ছন্দে"। [৬৮] 'মালতী' [৬৯] বললেই দশ বছরের একটি মেয়ের কথা কবির মনে পড়ে যে ফুল ফুলতে আসত। এসব কবিতায় অতীত ইতিহাস স্মৃতিরোমাঞ্চ কিংবা পুরাণ আছে কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য ধরা পড়েনি। চীনে করবী কবির স্মৃতিকথায়ও স্থান পেয়েছিল।

চীনে করবীর ফুল
তোরে দেখি মোর মাঝে মাঝে হয় ভুল
কমিত কণক করি সমাহার
বিরচিল তোরে কোন মণিকার
কপোলের পরে কানন রমার তুই কি সোনার দুল?[৭০]

দ্রোণপুষ্প নিতান্ত অবজ্ঞাত ফুল। বাগানে তার ঠাঁই নেই সে আগাছার মতো অযত্নে ফোটে। কবি তাকে বলেছেন -

গ্রীষ্মারের দুল নীহারের ভুল ডহরের ফুল তুই
বাগ বাগিচায় ঠাঁই নাই তোর মাঘ ফাগুনের যুঁই
বাণীর চরণে ফুটুক কুন্দ ভক্তের প্রাঙ্গনে
রমার চরণে ফুটে থাক তুই ক্ষেতের একটি কোণে।[৭১]

সূত্র নির্দেশিকা

পল্লীচিত্র ও পল্লী প্রকৃতি

১. রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ, অরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রাইমা পাবলিকেশনস্, ১৯৭৮

২. পল্লী, কুমুদরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ.৭৮

৩. বাসনা, ঝরাফুল, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

৪. রেখা, যতীন্দ্রমোহন বাগচী রচনাবলী, জ্যোতির্ময় ঘোষ সম্পাদিত, পৃ.৮১

৫. দিন ফুরানোর গান, কালিদাস রায়, পৃ.৫

৬. কবিপত্র, ১৪.৮.৬৮

৭. ঐ

৮. প্রকৃতি ও প্রেম, সাহিত্য প্রসঙ্গ (১ম খন্ড), কালিদাস রায়।

৯. কবিশেখর : চিন্তন ও মনন, মোহিতলাল মজুমদার, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, নন্দলাল সেনগুপ্ত, পৃ.২৫

১০. প্রত্যাবর্তন, হৈমন্তী, কালিদাস রায়, পৃ.৬

১১. ঐ, পৃ.৭

১২. পল্লীশ্রী, হৈমন্তী, কালিদাস রায়, পৃ.৬৮

১৩. ঐ, পৃ.৬৯

১৪. ছায়া, হৈমন্তী, কালিদাস রায়, পৃ.৩৫

১৫. গ্রামপথে, সন্ধ্যামণি, কালিদাস রায়, পৃ.১৭

১৬. শরতের গ্রামপথে, হৈমন্তী, কালিদাস রায়, পৃ.৪৮

১৭. ঐ

১৮. বিদ্যালয়ের পথে, আহরণী(নবপর্যায়), কালিদাস রায়, পৃ.৪৪

১৯. ঐ

২০. ঐ, পৃ.৪৬

২১। শরতের গ্রামপথে, হৈমন্তী, কালিদাস রায়, পৃ।৪৮

২২। ঐ

২৩। মেঠোপথ, আহরণী(নবপর্যায়), কালিদাস রায়, পৃ।১২২

২৪। ঐ

২৫। ত্রিপথ, সন্ধ্যামণি, কালিদাস রায়, পৃ।১৫৯

২৬। রেলপথ, ঐ, পৃ।১৬৪

২৭। বাংলার দীঘি, আহরণ, কালিদাস রায়, পৃ।৯৪

২৮। ঐ

২৯। ঐ

৩০। স্নানের ঘাটে, হৈমন্তী, কালিদাস রায়, পৃ।১৩

৩১। ঐ

৩২। গ্রামপথে, আহরণ, কালিদাস রায়, পৃ।৯০

৩৩। ষষ্ঠীতলা, পর্ণপুট (২য় খণ্ড), কালিদাস রায়, পৃ।৭১

৩৪। আহরণ, কালিদাস রায়, পৃ।৯৩

৩৫। লক্ষ্মীমাসে, সন্ধ্যামণি, কালিদাস রায়, পৃ।২৭

৩৬। পৌষের গান, কালিদাস রায়, পৃ।২২৬

৩৭। ঐ

৩৮। পর্ণপুট, কালিদাস রায়, পৃ।৬৫

৩৯। সন্ধ্যামণি, কালিদাস রায়, পৃ।৯৯

৪০। পর্ণপুট (৫ম সং), কালিদাস রায়, পৃ।৫৯,

৪১। মুখরা, পর্ণপুট (২য়), কালিদাস রায়, পৃ।২৩

৪২। বঙ্গলক্ষ্মী, আহরণ, কালিদাস রায়, পৃ।৯৯

৪৩। ঐ

৪৪। ঐ

৪৫। ঐ

৪৬. পল্লী থেকে নগরে, কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ.২০৩

৪৭. ভূতেবাড়ী, পর্ণপুট ১ম, কালিদাস রায়, পৃ.৬১

৪৮. বঙ্গলক্ষ্মী, আহরণ, কালিদাস রায়, পৃ.১০০

৪৯. স্মৃতিকথা, কথাসাহিত্য, মাঘ, ১৩৫৮।

৫০. ঐ

৫১. স্মৃতিকথা, কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৫৯

৫২. ঋতুলক্ষ্মী, সন্ধ্যামণি, কালিদাস রায়, পৃ.৪৩

৫৩. আষাঢ়ের কথা, সন্ধ্যামণি, কালিদাস রায়, পৃ.১৭২

৫৪. বৈশাখী সন্ধ্যায়, কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ.১৭৪

৫৫. আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ.২৬২

৫৬. শ্রাবণ পূর্ণিমা, কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ.৩১৫

৫৭. হৈমন্তী, কালিদাস রায়, পৃ.১১০

৫৮. আহরণ, কালিদাস রায়, পৃ.৮১

৫৯. বর্ষার রূপ, কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ.৩৭

৬০. কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ.১৪৪

৬১. শরতের গ্রাম পথে, হৈমন্তী, কালিদাস রায়, পৃ.৪৮

৬২. কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ.১০০

৬৩. ঐ

৬৪. ঋতুমঙ্গল, কালিদাস রায়, পৃ.৬০

৬৫. ঐ

৬৬. পল্লীবধূ, আহরণ, কালিদাস রায়, পৃ.৯৩

৬৭. জবা, আহরণ, কালিদাস রায়, পৃ.১৩৭

৬৮. কদম্ব, আহরণ, কালিদাস রায়, পৃ.১৩৯

৬৯. মালতী, আহরণ, কালিদাস রায়, পৃ.১৩৮

৭০. চীনে করবী, সন্ধ্যামণি, কালিদাস রায়, পৃ.১৯৭

৭১. দ্রোনপুষ্প, কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ.২৪৪